নারীর স্বাবলম্বন ঃ অন্তহীন চলার ইতিহাস

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী

অপর্ণা সেন পরিচালিত 'পারমিতার একদিন' চলচ্চিত্রে সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মজ' কবিতাটি ব্যবহার করা হয়েছে পারমিতার অসুখী দাম্পত্যের একমাত্র স ম্পদ সন্তান স্নেহ প্রকাশের জন্য। কবিতাটি যেন মেয়েদের জীবনের যে কোন প্রেক্ষিতের উপযোগী। শুধু আত্মজ কেন, শিক্ষা, প্রেম, স্বাধীনতা, সংসার, আত্মপ্রতিষ্ঠা, সন্তানের অভিভাবকত্ব, স্বাবলম্বন — মেয়েদের যে কোনো প্রাপ্তির ইতিহাস যেন ধরা আছে কবিতার প্রথম আটটি পংক্তিতে—

"দীর্ঘ বড়ো দীর্ঘ ছিল দিন
ক্ষ বড়ো ক্ষ ছিল পথ - ও,
তবুও তোকে আনতে গিয়ে একা
সয়েছি বুকে রক্ত - ঝরা ক্ষত।
তুমুল সে কি তুমুল ছিল ঝড়
বুক দুম দুম গহীন কালো রাত
সহায় কোথাও মেলেনি একতিল
একলা পথে ধরেনি কেউ হাত।

মেয়েদের ইতিহাস, একলা চলার ইতিহাস। তাই ফিরে দেখতে বসেছি মেয়েদের কলমে মেয়েদের সেই একলা চলার ইতিহাস কতটা ধরা দিয়েছে বাংলা ছোটগল্পে। লেখিকাদের আলাদা করে দেখা বা আলোচনা করা অনেকের মতে মর্যাদাকর নয়। কিন্তু একই সামাজিক প্রতিবেশে, একই সংসার ভূমিতে দাঁড়িয়েও একটি মেয়ে ও একটি পুষ যে ভিন্ন ভাবে জীবনকে দেখে, ভাবে এবং সমাধান খোঁজে — তা-ই বা অস্বীকারকরা যায় কিভাবে। মর্যাদা অমর্যাদার প্রা নয়, হীনমন্যতা উচ্চমন্যতার প্রা নয় — প্রা স্বাতন্ত্র্যের।
আবার দীর্ঘকাল পুষ - শাসিত সমাজের চাপে, শিক্ষার অভাবে, পিছিয়ে ছিল বলেই আপন স্বাতন্ত্র্যকে চিনতে এবং চেনারপরেও সেই স্বাতন্ত্র্যকে যথাযথ শিল্পরূপ দিতে একটু সময় লেগেছে মেয়েদের। তবু আজ গর্ববোধ হয় নারীর নিজস্ব উচ্চারণ - ভঙ্গিটি চিহ্নিত হতে দেখে।
নারীর কলমে ধরা দিল সেই সব কথা। যে সব কথায় মেয়েদের সহজাধিকার, যেসব কথা তার দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায় ঢাকা ছিল, যেসব কথা অবহেলার যোগ্য বলে শিখিয়েছিল এ - সমাজ — সে সব কথা কেমনভাবে বলেছেন মেয়েরা, কেমনভাবে মর্যাদার আসনে তাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন — তারই কিছু প্রসঙ্গ ছুঁয়ে, এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে, মেয়েদের একলা চলার, স্বাবলম্বন অর্জনেরচিত্রটি বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। সেরা লেখিকাদের সেরা গল্প সংকলনের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বাণী বসু বলেন —
"অনেকে মনে করেন, নারী লেখিকাদের আলাদা করে বিচার করা ঠিক নয়। ইতিহাসের পরামর্শ অন্য রকম। ইতিহাস মানেতো শুধু সাহিত্যের ইতিহাস নয়, সম াজেরও ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও ইতিহাস। সমাজের অন্দরমহল এবং অন্তর মহলের ঘনিষ্ঠখবরাখবর মেয়েদের ঝুলিতে যতটা ধরা থাকে, ততটা আর কোথ াও থাকে না। বিশেষত এই দ্বিতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনকে স্বীকার করেই এই সংকলন। এবং গল্প বাছার সময়ে যা সবচেয়ে বেশি বিবেচিত হয়েছে তা হল বিবর্তমান নারীমানস, তার মনোযোগবিন্দুর প্রতিসরণ।"
প্রবন্ধের পরিসরটি নির্দিষ্ট করে নেওয়া যাক। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩১) থেকে মহাশ্বেতা দেবী (১৯৬২) এই সময়কালের মধ্যে রচিত গুটি কয়েক গল্প অবলম্ বনে স্বাবলম্বনের পথে বাঙালি নারীর এগিয়ে চলার ইতিহাসের রূপরেখাটুক বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। সেই চলার প্রবণতা কিভাবে জটিল করে তুলেছে তার ব্যক্তিজীবন, সেই সময়কার সমাজের অন্দরমহল ও নারীর অন্তরমহলে কিভাবে তৈরি হয়েছে সংঘাত, কিভাবে বিবর্তিত হচ্ছে নারীর মন, কেমন করে ঘটছে তার মনযোগবিন্দুর প্রতিসরণ এসব ছুঁয়ে যাবো প্রসঙ্গের অনুষঙ্গে।
রবীন্দ্রনাথের মাপের প্রতিভা বা ছোটগল্পের শৈলী বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা — কোনোটাই ছিল না তাঁর দিদি স্বর্ণকুমারীর। তবু দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে ইংরাজি ছোটগল্পের তর্জমা শুনে উৎসাহিত স্বর্ণকুমারী গল্প রচনা শু করেন। তাঁর গল্প সংকলনের নাম দিয়েছিলেন 'নব কাহিনী বা ছোট ছোট গল্প।' ছোট ছোট গল্প -ই, শৈল্পিকতা বিচারে তাঁর বেশির ভাগ গল্পই সার্থক ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বাঙালি বিদুষী নারীর মনোযোগবিন্দুর প্রতিসরণ যে যে গল্পে সূক্ষ্ম অথবা প্রকটভাবে ধরা পড়েছে তাদের অবশ্যই নব কাহিনী বলতে হয়। ঐতিহাসিক গল্পরচনায় স্বর্ণকুমারী তেমন সফল না হলেও পারিবারিক সামাজিক গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য।
স্বর্ণকুমারীর গল্পে নারীর স্বাবলম্বনের ইতিহাস অবশ্যই লক্ষ্য করা যাবে না; কিন্তু নারীর যন্ত্রণাময় সামাজিক পারিবারিক অবস্থান - সম্পর্কে নারীর সচেতনতা, অ ান্তরিক সহানুভূতি ও প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায় তাঁর গল্পে। এই সচেতনতা, এই সহানুভূতি - ই ক্রমে নারীকে স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা যোগাবে; তারই সঙ্গে সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে ক্রমে গুত্ব পাবে নারীর প্রতি নারীর সখ্য, সমবেদনা। যেমনটি দেখা যায় স্বর্ণকুমারীর 'লজ্জাবতী' গল্পে। 'লজ্জাবতী' এক সরলা, কোমলা গৃহবধূর

জীবনযন্ত্রণা ও মৃত্যুর গল্প। বাংলা গল্পের অতি পুরোন, পরিচিত বিষয়। কিন্তু গল্পের সম্পদ হল লজ্জাবতীর ননদ ফুলকুমারীর চরিত্রটি। 'ননদ - কাঁটা' কথাটিকে মিথ্যে প্রমাণ করে সংবেদনশীল ফুলকুমারী ভালোবেসেছে সংসারে মাকে অত্যাচারী শাশুড়ি রূপে দেখে। আর লজ্জাবতী -র মৃত্যুর পর যখন নিজের দোষ ঢাকতে, পাড়া জানিয়ে কেঁদেছে ফুলকুমারীর মা ও তার অনুগামীরা তখন ফুলকুমারী সে কান্নায় যোগ দিতে পারে না। গোপনে দগ্ধ হয় সে লজ্জায় অনুশোচনায়। অর্থাৎ ফুলকুমারীর সহানুভূতি।

শোক — কোনোটি-ই বাহ্যিক, সাময়িক, লঘু প্রতিক্রিয়া নয়। নারী জীবনের অন্যায় অপরিচিতিতে এক সচেতন নারীর গভীর যন্ত্রণা প্রকাশিত ফুলকুমারী চরিত্রে। এই যন্ত্রণা ও সচেতনতাই নারীকে ক্রমে এগিয়ে দেবে স্বাবলম্বনের পথে। আবার যতোই নারী সচেতন ও স্বাবলম্বী হবে — ততোই সহানুভূতিশীল হবে নারীর প্রতি, এমনকি কন্যা সন্তানের প্রতি। নারী লিখিত ছোটগল্পে সেই ইতিহাসও ধরা রইল।।

যেমন ধরা আছে কন্যা তথা নারী বিষয়ে সচেতনতার আগে বাঙালি পরিবারের কন্যার চূড়ান্ত অনাদরের ছবি। স্বর্ণকুমারীর 'গহনা' গল্পটিতে কেরানি বিহারীলাল সেন বহুকষ্টে তাঁর একমাত্র ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়েছেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে —"যাহাতে সে মানুষের মত মানুষ হইতে পারে অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারে।"

পুত্রের জন্য বিহারীলাল সাধ্যতীত ব্যয় এবং কন্যা হেমার চিকিৎসার ব্যবস্থা না করার অসঙ্গতিটুকু খুব স্বল্প সংযত আঁচড়ে মর্মস্পর্শীভাবে দেখিয়েছেন স্বর্ণকুমারী। বিহারীলালের স্ত্রী যখন স্বামীকে বলেন "ওগো হেমার জ্বর ত কই সারছে না, একবার ডাক্তার ডাকাও।" কর্তা জবাব দেন —"একোনাইট দিয়েছিলে? সামান্য জ্বরে আর ডাক্তার ডেকে কি হবে? আরো দুচার দিন দেখা যাক।"

লেখিকা অবশ্য জানিয়ে দিলেন —"আসল কথা ডাক্তারের পয়সার অনটন; কিন্তু স্ত্রীর সাক্ষাতেও সে দুঃখের কথা ফুটিয়ে বলিতে জিহ্বা সরে না।"

সেদিনই বিহারীলালের শ্যালক, একদা বিহারীলালের অন্নে প্রতিপালিত মানিক, তার দিদির অর্থ - সাহায্য প্রার্থনার উত্তরে মানিক বহু অপমানজনক কথাসহ ৫০০ টাকা পত্রযোগে পাঠায়। অপমানিত বিহারীবাবু প্রথমে সে টাকা ফেরৎ দিতে চাইলেও ছেলের প্রয়োজনের কথা ভেবে, স্ত্রীর পরামর্শে সে টাকা গ্রহণ করেন ও পুত্রকে মানি - অর্ডার করে পাঠান। অথচ সে টাকার সামান্যতম অংশ হেমার চিকিৎসার জন্য খরচ করার কথা বাবা - মা কারই মনে হয়নি। কন্যাসন্তানের জীবন - মৃত্যু নিয়ে এতোটা ভাবার রেওয়াজই ছিল না তখন।

হেমার জ্বর যদিও সারল না। কিন্তু কিছুদিন পরেই নলিনের পাশের খবর এলো। "খবর পাইয়া বিহারীবাবু স্ফীত হৃদয়ে ধরাখানাকে সরার মত জ্ঞান করিতে করিতে অফিসে চলিয়া গেলেন।" বিহারীবাবুকে কিন্তু কন্যার জন্য উদ্বিগ্ন বা শোকার্ত হতে দেখা যায়নি গল্পে। হেমার মৃত্যুর পর লেখিকা শুধু একবার জানিয়েছেন 'পিতা - মাতার আনন্দে নিরানন্দ হইয়া পড়িলেন।'

মায়ের শোক গভীর হলেও পুত্রের মুখ চেয়ে সে শোক সহনীয়। বাঙালি লেখক- লেখিকারা কণ রসসৃষ্টির সুযোগ পেলে সাধারণত অসংযত হয়ে পড়েন, অথচ স্বর্ণকুমারীর সংযম অতুলনীয়। আবেগকে বলগাহীন হতে দেননি বলেই তাঁর গল্পে কণ বিষয় উপস্থাপিত গাম্ভীর্য, গভীরতা ও মর্যাদাসহ।

তাই 'গহনা' গল্পের অতি ক্ষুদ্র পর্শ্ব চরিত্র হেমার অতি - সংক্ষিপ্ত কাহিনী মাত্র কটি আঁচড়ে বর্ণনা করেছেন তিনি। হেমার দুটি সংলাপ ও জ্বর - পীড়িত, ক্লান্ত, বিস্মিত একটি চাহনি পাঠকের মনে গাঁথা হয়ে থাকে। তৎকালীন সমাজের অন্দরমহলের আর মেয়েদের অন্তরমহলের একটি অধ্যায় ধরা থাকে ঐ সামান্য কটি আঁচড়ে।

নলিনের পাশের খবর পেয়ে "গৃহিনী সে পরমানন্দ নিজের মধ্যে রাখিবার স্থান না পাইয়া হাতা বেড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া তাঁহার পীড়িত কন্যার নিকট আগমন করিলেন। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা হেমাপ্রভা জ্বরের ঘোরে অর্দ্ধ - অচেতন অবস্থায় শয্যালগ্ন হইয়াছিল, মা আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়ে নাড়িয়া বলিলেন, "হেমা, হেমা তোর দাদা পাশ হয়েছে"। হেমা চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়ে বিস্ময় - দৃষ্টিতে মাতার দিকে চাহিল; মা আবার বলিলেন— "তোমার দাদা পাশ হয়েছে"। হেমপ্রভার মলিন বিবর্ণ মুখও এই কথায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ক্ষীণ ক্লান্ত স্বরে বলিল, দাদা কবে আসবে"? মা বলিলেন — "শিগ্‌গির"। হেমাপ্রভা বলিল —"আমি ত দেখতে পাব?" আনন্দ আগ্রহে গৃহিনী এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে হেমার অসুখ, এই কথায় আত্মস্থ হইয়া সোৎকণ্ঠস্বরে বলিলেন "বালাই, ও কি কথা; দেখতে পাবে বইকি।"

কিন্তু এবার মাতার আশীর্বাদ ব্যর্থ হইল, হেমার সহিত তাহার দাদার দেখা হইল না।"

বারো বছরের হেমা, তার খেলার সঙ্গী ভাবিনী, মুখচোরা লজ্জাবতী, সংবেদনশীল ফুলকুমারী প্রতিটি নারী চরিত্র অংকনে স্বর্ণকুমারী আন্তরিক ও সংযত। নারীর দুঃখ, অবমাননাকে মর্যাদা দিয়েছেন তিনি সংযত, অনতিভাষণে।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী (১৮৬১-১৯২০) রচিত 'আদরের, না অনাদরের?' সার্থক ছোট গল্প হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সমস্ত খুঁটি - নাটি সহ জীবন্ত ভাবে উপস্থিত সে যুগের সামাজিক - পারিবারিক প্রেক্ষিতে কন্যাসন্তানের জন্মমুহূর্ত। দাসি, ধাত্রী, ঠাকুমা, বাবা, মা এবং প্রতিবেশীগণ সকলেই অত্যন্ত বিচলিত ও শোকার্ত হয়ে ওঠে এক সুন্দর সকালে, কাল মিত্রদের ঘরে আবার একটি কন্যার জন্ম হয়েছে। কন্যার জন্মে নারীরাই সর্বাপেক্ষা বিরক্ত, লজ্জিত। পুকুরঘাটে সকাল থেকে তারই চর্চা চলছে।

এই চর্চায় বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করেছে চোদ্দ বছরের মেয়ে প্রভা। কৃষ্ণদাসীকে ডেকে সে বলে "তোমাদের এক কথা, মেয়ে বুঝি কোন কাজে লাগে না ? তুমি এই যে আষাঢ় মাসে এখানে এসেছ, দুতিন মাস যে ক'রে দিদিমার সেবা করছ, মামা তেমন করেন? দিদিমাই ত দুঃখ করেন, আমার মেয়ে অসময়ে যত করে, ছেলে আমার তেমন করে না। তার বেলা বুঝি মেয়ের দরকার — এদিকে মেয়ে হয়েছে শুনলেই সর্বনাশ বাধে। এই যে ও - বাড়ির ছোট ঠাকুরমা -- কাকা ত এক পয়সা আনতে পারে না — যাই, ক্ষেমা পিসি ছিলেন, তিনি খরচপত্র দিচ্ছেন, তবে কাকা সুদ্ধ চলছে। কিন্তু শুনেছি, ক্ষেমা পিসির আগে আর দুবোন হয়, তাই ওঁর নাম ক্ষেমা রেখেছিল।" প্রভাকে সমর্থন করে সমবয়স্কা হরিদাসী। সংলাপগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ কিন্তু তৎকালীন সমাজের খুঁটিনাটি ধরা পড়েছে সার্থকভাবে। হরিদাসী বলেছে — "...বাবা - মা, স্বামী - পুত্র, কারও অসুখ হোক, কারও অনটন হোক, মেয়েতে যত করে, এত কোন্ ছেলেতে করে গা? মাকে মেয়ে যত যত্ন করে, মায়ের দুঃখ যত মেয়েতে বোঝে, এত কি ছেলেতে বোঝে?... মেয়ে হয়েছে শুনেই তোমরা লাফিয়ে ওঠ, কি না বিয়ে দিতে হবে! তা বাপু, ছেলের জন্য কি কিছু খরচ নেই ? সেনেদের বাড়ী দেখতে পাই, ছেলেদের খাওয়া হ'লে তবে সেই পাতে মেয়েদের অম্নি যা - তা দিয়ে খেতে দেয়। ছেলেদের জুতো, জামা, সাফ কাপড়, মেয়েদের ময়লা পাচা ধুতি। ছেলেদের দুপয়সা করে এক এক জনের খাবার বরাদ্দ, মেয়েদের এক পয়সার আটার টি করে তিন চারটিকে দেয়। ছেলেরা ভাল গদিতে খাটে শোয়— মেয়েগুলি মেঝেতে মাদুরে একটা ছেঁড়া লেপ পেতে শোয়। বড় বড় ছেলেরাও মা - বাপের সঙ্গে শুতে পায়, ছোটবোন দুটি রাঁধুনীর কাছে শোয়।"

কন্যা - সন্তানের অনাদর সচেতন লেখিকাদের ভাবিয়েছে, ব্যথিত ও ক্ষুদ্ধ করেছে— এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না। লেখিকা অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) নারী - কল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, প্রতিষ্ঠা করেন মহিলা সমবায়, যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন নারী - শিক্ষামূলক কার্য - কলাপের সঙ্গে তাঁর গল্পে তাই আসত শিক্ষিতা, স্বাবলম্বী নারীর কথা, নারী এবং পুষের মানসিক দার্ঢ্য, জীবনসঙ্গী বেছে নেবার স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

'অযাচিত' গল্পে কুৎসিত দর্শন, অবিবাহিত জমিদার হৃদয়নাথ মার্জিত, সহজ ভঙ্গিতে বিবাহ প্রস্তাব জানিয়েছেন তাঁরই গ্রামের দরিদ্র প্রজা হরিহর শ্বাসের বয়স্থা, শিক্ষিতা, সুন্দরী কন্যা সুমিত্রাকে। সুমিত্রার মতামত জানতে চেয়েছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। সুমিত্রা মনে মনে মেডিকাল কলেজের ছাত্র প্রভাসকে ভালোবাসলেও সংসারের

দারিদ্র ঘোচাবার আশায় এ - বিবাহে সম্মত হয়। সুমিত্রার বোন কল্যাণীর কাছে সত্য জানার পর দুঃখিত হৃদয়নাথ সুমিত্রার জন্য আনা ফুলের তোড়া ফেরৎ নিয়ে যেতে চান, তবে প্রতিশ্রুতি দেন হরিহর বিশ্বাসের দূরের ব্যবস্থা করবেন।

কুৎসিত দর্শন, হৃদয়বান, হৃদয়নাথকে ভালোবেসে ফেলে দৃঢ়চেতা কল্যাণী। হৃদয়নাথের ফুলের তোড়াটি প্রার্থনার মাধ্যমে প্রেম জানায় সে হৃদয়নাথকে। হৃদয়নাথ কল্যাণীর প্রেমকে সাময়িক কণা ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত হলে কল্যাণী জানায় --- "আমার চিত্ত খুব যে কণ নয় --- তারও প্রমাণ আপনি পেয়েছেন, আর আমি যা একবার স্থির করি --- তার কখন বদল হয় না।..."

কল্যাণী, সুমিত্রা, হৃদয়নাথকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন লেখিকা। সবল উপস্থাপনায় কল্যাণীয় দার্ঢ্য পাঠকের সমীহ জাগায়। প্লট ও বেশ আঁটসাঁট।

বঙ্গ সন্তানের জনক দরিদ্র হরিহর বিশ্বাসের বড় দুই কন্যা সুমিত্রা ও কল্যাণী সুন্দর চেহারার সুবাদে কলকাতাবাসিনী মাসিরস্নেহধন্য ছিল। কলকাতায় মাসির কাছে বড় হবার জন্য শিক্ষা, স্বাধীন ভাবনা - চিন্তা ক্ষমতা তারা অর্জন করেছে। মাসির কৃপাধন্য দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র প্রভাসকে ভালোবেসেছে সুমিত্রা। কিন্তু প্লেগে মাসির মৃত্যু হলে অসুস্থ মা ও দরিদ্র পিতার সংসারে ফিরে আসে কল্যাণীও সুমিত্রা। হরিহরের দরিদ্র সংসারের হাল ধরে এই দুই কন্যা।

বাবার দারিদ্র মোচনের জন্য গ্রামের নবস্থাপিত বালিকা পাঠশালায় শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করে সুমিত্রা মাসিক পনেরো টাকা মাহিনায়। সুমিত্রার বাবা প্রথমে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি কন্যার চাকরি গ্রহণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু, সুমিত্রা যদি আন্তরিক অনিচ্ছা নিয়ে ও শুধু মাত্র বাবার দারিদ্র মোচনের জন্য হৃদয়নাথকে বিয়ে করতো, তাহলে হরিহরের আপত্তি থাকতো না। শেষপর্যন্ত মেয়ের চাকরি সংক্রান্ত আপত্তি নরম হয়েছে, কারণ, "...মাসিক পনেরো টাকার লোভ ত্যাগ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।"

গ্রাম্য সমাজ সুমিত্রা - কল্যাণীর নিন্দেয় মুখর হলে স্পষ্ট ভাষিনী কল্যাণী বলে "যারা নিন্দে করেছিল, তারা কি আমাদের বিপদের দিনে এতটুকু সাহায্য করেছিল, বাবা?"

গ্রামের লোকের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে লেখিকা বলেন "একে আইবুড়া হাতীর মত মেয়ে দেখিয়াই গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর সেই ধেড়ে মেয়ে যখন গুমা সাজিত, তখন আর তাহারা বিস্ময় ও লজ্জা রাখিবার স্থান পাইল না।"

জমিদার হৃদয়নাথের সচেতনও প্রেমিকা নারীকে পত্নী হিসেবে কামনা করাও প্রমাণ করে নারীসম্পর্কে পুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে। পুষের চাহিদা অনুযায়ী নারী - জীবন, কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়। মোটকথা পুষের পরিবর্তিত চাহিদাও নারীকে প্রথমে শিক্ষা, ক্রমে শিক্ষা - প্রসূত সচেতনতা, স্বাবলম্বনের দিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা যুগিয়েছে। হৃদয়নাথ যতোই কুশ্রী হন, জমিদার বলেই বিবাহে তাঁর কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন সচেতন সহধর্মিণী।

এমনি নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে নারী এক পা, এক পা করে এগোচ্ছিল শিক্ষা, স্বাবলম্বন ও সংসার প্রতিপালনের পথে। তারই প্রতিফলন অনুরূপা দেবীর গল্পটিতে। যদিও তাঁর অধিকাংশ গল্পের নারীর অতিরিক্ত সচেতনতা, জ্ঞান দেবার স্পৃহা, আদর্শ প্রচারের চেষ্টা শিল্পরস ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু প্রশংসনীয় তাঁর গল্পে নারী - ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ের দলিলীকরণ।

'অযাচিত' গল্পে যেমন দেখা গেল দরিদ্র পিতা মেয়েকে চাকরি করার অনুমতি দিলেন দারিদ্র মুক্তির আশায়, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে, তেমনি সরোজকুমারী দেবী-র (১৮৭৫-১৯২৬) 'খানতিনেক চিঠি' গল্পে তণী অমিয়ার বৃদ্ধ স্বামী অমিয়াকে গ্রামের নব - প্রতিষ্ঠিত বালিকা - বিদ্যালয়ে চাকরি করার অনুমতি দিয়েছেন, কারণ "...মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রতি তাঁর চিরদিনের যে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা ছিল, দাণ অভাব ও অন্নচিন্তায় পড়ে ক্রমে সেটা অন্তর্হিত হয়ে আসছিল।"

অতএব, বাঙালী পুষের অবিবেচনা - প্রসূত বৃহৎ - সংসার - জাত - দারিদ্র ও অক্ষমতা এবং আর্থিক পরিবেশ মেয়েদের স্বাবলম্বনের পথকে প্রশস্ত করছিল ক্রমে, নিঃশব্দে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে মহিলা রচিত এই ছোটগল্পে।

'খানতিনেক চিঠি' গল্পটি নারীর স্বাধীন ভাবনার পরিচায়ক হিসেবে আরও অনেকটা এগিয়ে। বিধবা অমিয়াকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন শিক্ষানুরাগী, জমিদার তনয় শরৎবাবু। গ্রামের লোকের কুৎসা, পিতার ক্রোধ, পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা -- কোন প্রতিকূলতাতেই শরৎবাবু পিছিয়ে যাননি। শরৎবাবুর প্রতি দুর্বলতা থাকলেও অমিয়া এ- বিবাহে রাজি হয়নি। গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে অজানার উদ্দেশে। কিন্তু, লক্ষণীয় এই গৃহত্যাগের সময় ক্ষুণ্ণ হয়নি অমিয়ার আত্মবিশ্বাস। দিদিকে চিঠি লিখে জানিয়েছে--- "যেখানেই থাকি তোমাকে কখন ভুলব না। কোন জায়গায় একটু স্থিতি হয়ে বসেই আবার চিঠি লিখব।" অর্থাৎ এই গৃহত্যাগ অসহায় নারীর সর্বনাশের পথে পা বাড়ানো নয়। অমিয়া জানে সে বাঁচবে, কোথাও 'স্থিতি হয়ে' বসবে। শিক্ষা ও স্বাবলম্বন ছাড়া এই আত্মবিশ্বাস জন্মায় না।

যদিও স্বাবলম্বী হবার ইচ্ছার চেয়ে সংসার - বাঁচানোর চেষ্টাই সেদিন মেয়েদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। আবার অচিরেই সংসার নামক বৃহৎ যন্ত্রটি উপার্জন - সহ নারীর স্বাধীনতাকে গ্রাস করল। ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল সংসারের ভারবহনকারিণী চাকুরে নারীর জীবন। আশাপূর্ণা দেবীর (১৯০৯ - ১৯৯৫) 'স্বর্ণসূত্র' গল্পে সেই জটিলতার নগ্ন চিত্র।

স্বাবলম্বী তিলোত্তমা প্রেমিক কৌশিককে বিয়ে করতে, এমনকি সময় দিতেও অপরাগ; কারণ, তার ওপর নির্ভরশীল খোঁড়া দাদা, বৌদি ও তাদের ক্রমবর্ধমান সংসার। কৌশিকের সঙ্গে একটু বেশি সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরলে ভয়ানক আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে ভাইপো--ভাইঝিরা। এমনকি পঙ্গু দাদা অবুঝ শিশুর মতো না খেয়ে রাগ দেখায়। তিলোত্তমার সুখ, স্বাধীনতা, প্রেম -- সবই যেন গ্রাস করে নিতে চায় স্বার্থপর সংসার। সহ্যের সীমা পেরোলে তিলোত্তমাও পাল্টা আঘাত করে। দাদা - বৌদি সে আঘাতে সম্বিত ফিরে পেয়ে আহত ও লজ্জিত হয়। আঘাত দেবার পর তিলোত্তমারও সম্বিত ফেরে---

"হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, অশোকা ধুলোর ওপরই থেবড়ে বসে পড়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে, আর জগদীশ কেমন এক রকম ফ্যালফ্যাল করে, নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে বয়সে পাঁচসাত বছরের ছোট অন্নদাতা বোনের দিকে।"

সাময়িকভাবে দাদা ভাবে বোনকে এই ভয়ানক সংসারের জাল থেকে মুক্তি দেবে। বোন ভাবে কৌশিককে ফিরিয়ে দেবে দাদা ও তার সংসারের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে। আর লেখিকা জানান --- "হয়তো এসবই ক্ষণস্থায়ী। হয়তো আবার সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোৎস্নার মত মিলিয়ে যাবে এদের মনের এই মানসিকতার রঙিন আলো। হয়তো এখনকার এই সংকল্পগুলো পাগলের পাগলামি মনে হবে নিজের কাছে। অশোকা আবার ভারী কোমরে আঁচল জড়িয়ে কুৎসিত ভঙ্গিতে চেঁচাবে আর নেচে বেড়াবে। জগদীশ ফের খোকার মত অভিমান করে বসে থাকবে খোসামোদের আশায়, আর তিলোত্তমা কৌশিকের সঙ্গে যাবে বিবাহ অফিসে নাম দাখিল করতে।

তবু এই ক্ষণটুকু মিথ্যা নয়। এমনই এক একটি পরম ক্ষণ আছে বলেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ধ্বংস হতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত ধূলিজাল গ্রথিত হয়ে থাকে এই পরম ক্ষণের স্বর্ণসূত্রে।"

লেখিকার এ-উপলব্ধি সত্য; অবশ্য স্বর্ণসূত্রে সংসার বেঁধে রাখার প্রেরণা মেয়েরা কোথা থেকে পেলো, কোন স্বপ্নের দিকে চেয়ে -- তা সত্যিই ভাববার বিষয়। আজও এদেশে কন্যাভ্রূণ হত্যা হয় প্রতি বছর, শয়ে শয়ে।

জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮) তাঁর 'বেটি কা বাপ' গল্পে দেখিয়েছেন শুধু বাংলায় নয়, রাজস্থানেও কন্যার জন্ম হওয়া বাপের পক্ষে লজ্জাজনক। তাই কুশল

সিং - এর বৌ ফুলের মতো ছোট নাতনিটিকে আফিম দিয়ে মেরে ফেলে।
তবু স্বর্ণসূত্রে সংসারে বেঁধে রাখতে চায় মেয়েরা। স্বামী - সন্তানের মুখ চেয়ে বাঁচতে চায়। আজও। আবার সন্তানকে বাঁচাবার জন্য কখনও সংসারের গন্ডি ছাড়িয়ে পথে পা বাড়ায়।
যেমন বাড়িয়েছিল মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬) গিরিবালা। সন্তান ও স্বাবলম্বন এযুগের মেয়েদের জীবনের দুটি প্রান্তকে ধরে আছে। সন্তানকে নিয়ে সংসারের বাইরে পা বাড়াতে, সংসার ছাড়তে --- আজও তাদের সময় লাগে। স্বাবলম্বী হলেও। বহু বিবাহ - বিচ্ছিন্না বান্ধবী জানিয়েছে --- স্বামীর সংসার ত্যাগ করা অনিবার্য, অপরিহার্য বোঝার পরেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে রাতের পর রাত ঘুমোয়নি তারা। ভয় পেয়েছে; যদিও ঘরছাড়ার পর, অশিক্ষিত গিরিবালার মতোই তাদের মনে হয়েছে 'আগে যদি বুকে এ সাহস জোয়াত, তাহলে তো আগেই আসি।'
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামীর সংসার ত্যাগ করলেও, সন্তান ত্যাগ করে না মেয়েরা। অনেক সময় সন্তানের জন্যই সংসার ত্যাগ করে। যেমন করেছিল মহাশ্বেতা দেবীর গিরিবালা, তার কন্যা - সন্তানের জন্য।
গিরিবালার বিয়ে হয়েছিল নেশাখোর, বাউন্ডুলে আউলচাঁদের সঙ্গে। আউলচাঁদ অন্যের টাকা মেরে কন্যাপণ দিয়েছিল বলে আর কোন খোঁজখবর নেবার প্রয়োজন বোধ করেনি গিরির বাবা। আবার সব জানার পরেও আউলচাঁদের সঙ্গে গিরিকে বছরখানের বাদে সংসার করার জন্য কান্দী মহকুমার তালসানায় পাঠায় গিরির বাপ-মা; কারণ, আউলচাঁদ বউ নিতে খালি হাতে আসেনি। মস্ত মেটে আলু, শাশুড়ির জন্যে কাঁঠাল, কাঠের পিঁড়ি,শ্বশুরের জন্য চারটি নতুন বস্তা, বউয়ের জন্য নতুন কাপড় -- আর মুখে মিষ্টি কথা, যা মিথ্যা বুঝলেও প্রতিবাদ করা যায় না।
চোদ্দ বছরের গিরি আউলচাঁদের সঙ্গে বাবুদের বাগানের কোনে পাহারা দেবার ঝুরঝুরে ঘরটিতে গিয়ে যখন উঠেছিল - তখন কোনো ভরসাই ছিল না তার সামনে। বাবুদের ঝি তাকে বাপের বাড়ি গিয়ে রূপোর গয়না রেখে আসার পরমার্শ দেয় আউলচাঁদের হাত থেকে গয়না গুলি রক্ষা করার জন্য। কিন্তু শান্ত গিরি ধৈর্যের সঙ্গে, শ্রমের বিনিময় ক্রমে গড়ে তোলে স্বামী - স্ত্রীর বহুকাঙ্খিত একটি নিজস্ব ঘর। তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে হবার পর স্বামীর অনুমতি ছাড়াই অপারেশান করে সন্তান - জন্মানোর পথ বন্ধ করে আসে; সেজন্য স্বামীর হাতে মারও খায়
বাউন্ডুলে আউলচাঁদকে ক্রমে ঘরের নেশা পেয়ে বসে। গিরির অনুপস্থিতিতে বিহারি দালালের কাছে বড় মেয়ে, বারো বছরের বেলারানিকে বেঁচে দিয়ে সেই টাকায় ঘর ছায় আউলচাঁদ।
গল্পের শুতেই লেখিকা জানিয়েছেন "গিরিবালার কোনো নিজস্ব মনপ্রাণ আছে বলে কেউই বোঝেনি।" সেই গিরির যন্ত্রণাএঁকেছেন লেখিকা অসাধারণ নৈপুণ্যে, ছোট ছোট আঁচড়ে। প্রথমে গিরি হাহাকার করে কাঁদে। তারপর একদম নীরব হয়ে যায়। তার বুক জুড়ে হাজারো তুচ্ছ স্মৃতি তুষের আগুন হয়ে জ্বলে। মনে পড়ে বাবুর বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে ভারি পিঁড়ি পড়ে বেলির পা ছেঁচে যাওয়া, সুযোগ পেলেই বারো বছরের মেয়ের শিশুর মতো মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ঘুমোনো, মার অসুখ করলে বাবুর বাড়ির কাজের ফাঁকে মায়ের রান্না সেরে যাওয়া --মা ও মেয়ের অজস্র তুচ্ছ স্মৃতি। গিরি মনে মনে বলেন ---
বেলা, বেলারানি, বেলি---
ফেলি নয়তো বেলি--- মেয়ের নাম বেলি যমকে দিলেও গেলি জামাইকে দিলেও গেলি। ছড়াটির শেষ দুটি পংক্তি বারবার ধ্রুবপদের মতো ঘুরেফিরে গল্পে আসে। গিরিকে আউলচাঁদের ঘর করতে পাঠাবার সময় চোখের জলে এ - ছড়া বলেছে গিরির মা, গিরি ভেবেছে তার দুই মেয়ে বেলারানি ও পরীবালা দালালের হাত ঘুরে হারিয়ে যাবার পর, প্রতিবেশিনীরা বলেছে গিরিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে।
তবু যার মনপ্রাণ আছে বলে ভাবেইনি কেউ, সেই গিরিবালা ভুলতে পারে না তার দুই মেয়ের বিয়ের নামে বেবুশ্যে হয়ে যাওয়া। আন্তরিক ঘৃণায় সে ত্যাগ করে স্বামীকে, যে তার মেয়ে বিক্রির টাকায় সুখ কেনে, ঘর তোলে আর আড়ে আড়ে চায় কোলের মেয়ে মনির দিকে। কারণ আউলচাঁদ বুঝে গেছে, মেয়ে মানেই টাকা।
একদিন সকালে উঠে সবাই অবাক হয়ে যায়। গিরিবালা ভোর রাতে মনি আর ছেলে রাজীবকে নিয়ে বাঁস ধরে টাউনে চলে গেছে। নিশিন্দায় নেবে বংশী কে বলে গেছে পরীর বাবাকে বলো সে যেন তার ঘরে জন্ম জন্ম বাস করে। গিরি টাউনে ঝি খাটবে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করবে।"
গিরি বাপের বাড়িও যায়নি। যদিও তার বাবা তখন যথেষ্ট অবস্থাসম্পন্ন । সন্তান পালনের জন্য স্বাবলম্বনের পথ বেছে নিয়েছে সে।
গল্পের শেষটি একটু দেখে নেওয়া যাক--- "একথা জেনে সবাই অবাক হয়ে গেল, মাথা নাড়ল। বেলা আর পরীর যা হয়েছে, সে তো এখন ঘরে ঘরে হচ্ছে। তা বলে স্বামী ছেড়ে চলে যায় কে? কোন মেয়েছেলে?
সবাই নিশ্চিত হল যে আউলচাঁদ নয়, গিরিবালা মেয়েটি আসলে মন্দ। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে সবাই কী স্বস্তিই পেল? তা কী করে বলি!
আর মনিকে বুকে চেপে টাউনের পথে হাঁটতে হাঁটতে গিরি ভাবল, আগে যদি বুকে এ সাহস জোয়াত, তাহলে তো আগেই আমি, তবে কি পরি যায়, বেলা যায়?
ভাবতে ভাবতে তার মুখ চোখের জলে ভেসে গেল। তবু সে হেঁটে চলল।"
চারপাশে একটু চোখ মেলে তাকালেই দেখা যাবে উচ্চশিক্ষিতা, অল্পশিক্ষিতা, অশিক্ষিতা, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, হতদরিদ্র--- বহু গিরিবালা সাহসে ভয় করে স্বামী সংসার ত্যাগ করে স্বাবলম্বনের ভিন্ন সংজ্ঞা গড়ার জন্য পা বাড়িয়েছে। কিন্তু সন্তান ত্যাগ করেনি। শহর, শহরতলির ঘরে স্বামী --- ত্যাগিনী গিরিবালারা বাসন মাজে, সন্তান - পালন করে। কেউ বা অফিসে কাজ করে, স্কুলে - কলেজে পড়ায়। এখনও সমাজ প্রকাশ্যে না হলেও আড়ালে বলে 'মেয়েটি আসলে মন্দ।'
এভাবেই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে সংসার ও নিজের অধিকার বাঁচাবার জন্যে স্বাবলম্বনের পথে এগিয়ে চলছে মেয়েরা, আজও এগোয়।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com